مجمل أصول أهل السنة والجماعة

في العقيدة

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

الدكتور / ناصر بن عبد الكريم العقل

ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল (রহিমাহুল্লাহ)

ترجمة: أبو سلمان محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

অনুবাদঃ আবু সালমান মুহাম্মাদ মুতিউল ইসলাম ইবন আলী আহমাদ

مراجعة: د/أبو بكر محمد زكريا

সম্পাদনাঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সমস্ত বিপর্যয় ও কু-কীর্তি থেকে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তার কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় তার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এই বইটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমার অসংখ্য ছাত্র ও শুভাকাঙ্খীদের আবেদনে পুস্তিকাটি লিখতে ও প্রচার করতে প্রায়াসী হই। বইটিতে আমাদের পূর্বসূরী ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের আক্বীদা-বিশ্বাস ও এর প্রকৃত অবস্থা, সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বইটি লেখার সময় বিশেষভাবে আমি যে বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি তাহলো শরী'আতসম্মত ভাষা ও পরিভাষার প্রয়োগ, যা বর্ণিত হয়েছে আমাদের সম্মানিত ইমামগণেদের নিকট থেকে, আর এজন্যই আমি আমার আলোচনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, প্রমাণপঞ্জি বা অন্যের উদ্ধৃতি উপস্থাপন কিংবা কোনো কথার ওপর টীকা লেখার পথ পরিহার করেছি, যদিও তা ছিল অপরিহার্য। এর আরেকটি কারণ আমার ইচ্ছাও ছিল যে বইটির কলেবর বৃদ্ধি না করে অল্প খরচে ও সহজভাবে এটিকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া।

আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ের এটি একটি সার সংক্ষেপ মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো পূর্ণ কলেবর বইয়ের মাধ্যমে এই পুস্তিকার অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদান করা যাবে।

গুরুত্ব যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত উলামা ও মাশাইখগণের সমীপে আমি বইটি উপস্থাপন করি।

১. আশ-শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাছের আল-বাররাক

২. আশ-শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান

৩. ড. হামযা ইবন হুসাইন আল-ফেয়ের

৪. ড. সফর ইবন আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালী

বইটি পড়ে তারা অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাদের মতামত পেশ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টীকা সংযোজন করেন।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে একান্ত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। দুরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী ও পরিবার-পরিজনের ওপর।

ড. নাসের ইবন আব্দুল করীম আল-আকল
৩/৯/১৪১১ হিজরী

ভূমিকা

আক্বীদাহর আভিধানিক অর্থ (العقيدة لغة): আক্বীদাহ্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আল-আক্বদ (العقد) বা বন্ধন, আত-তাওছীক্ব (التوثيق) বা দৃঢ়করণ, আল-ইহকাম (الإحكام) বা মজবুত করণ এবং আর-রবত্বু বি ক্বূওয়াহ (الربط بقوة) বা দৃঢ় করে বাঁধা বুঝানোর অর্থে।

আক্বীদাহর পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحاً): এমন সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায় যাতে বিশ্বাসকারীর নিকট কোন সন্দেহের উদ্রেক করতে না পারে।

ইসলামী আক্বীদাহ (العقيدة الإسلامية) বলতে বুঝায়: আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখা। আর ফরয হলো তার তাওহীদ (উলুহিয়্যাত বা ইবাদত, রুবুবিয়াত এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত বা নাম ও গুণাবলীর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা) ও তার আনুগত্যকে মেনে নেয়া। আর ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল রসূল, আখিরাত দিবস, তাক্বদীরের ভালো মন্দ, কুরআন হাদীছে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল গায়েবী বিষয় এবং যাবতীয় সংবাদ, অকাট্যভাবে প্রমাণিত সকল তত্ত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

সালাফে ছ্বলিহীন (السلف): সালাফে ছ্বলিহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন সোনালী যুগের লোকদের অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেঈন ও আমাদের সম্মানিত হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণ। আর তাদের অনুসরণকারী এবং তাদের পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের প্রতি সম্বোধন করত সালাফী (سلفي) বলা হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (أهل السنة والجماعة): আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীগণ যেই মতাদর্শের ওপরে ছিলেন সেই মতাদর্শের ওপরে থাকেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং সেই সুন্নাহর অনুসরণ করার জন্যে তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ (**أهل السنة**) বলা হয়।

তাদেরকে আল জামা'আত (**الجماعة**) বলা হয় এ মর্মে যে, তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হননি। এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরী ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ একমত হয়েছেন তারা তার অনুসরণ করেন, এ সমস্ত কারণেই তাদেরকে আল-জামা'আত বলা হয়।

এছাড়া রসূলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে (أهل الحديث) আহলে হাদীছ, কখনো (أهل الأثر) আহলে আছার, কখনো (أهل الاتباع) অনুসরণকারী দল, (الطائفة المنصورة) সাহায্যপ্রাপ্ত দল ও (الفرقة الناجية) মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।[১]

---

[১] সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হবে জান্নাতী। আর ৭২টি দল হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারা জান্নাতী ? তিনি বললেন :

«الْجَمَاعَةُ»

আল জামা'আত (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের জামা'আত)। ছ্বহীহ*: ইবনে মাজাহ ৩৯৯২; আবূদাউদ ৪৫৯৭।*

وَتَـفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً فَقِيلَ لَهُ : مَا الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَـوْمَ وَأَصْحَابِي.

আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই হবে জাহান্নামী। বলা হলো একটি দল (যারা জান্নাতী) কারা? তিনি বললেন: আমি এবং আমার সাহাবীরা আজকের দিনে যার উপর (প্রতিষ্ঠিত)। *হাসান, তিরমিযী ২৬৪১, মুসতাদরাক হাকীম ৪৪৪, কিতাবুল ইলম।*

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণের মূল উৎস এবং তার প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপনের পদ্ধতি

১. ইসলামী আক্বীদাহ গ্রহণের মূল উৎস কুরআনুল কারীম, ছ্বহীহ হাদীছ ও সালাফে ছ্বলিহীনের ইজমা।[২]

২. আক্বীদাহসহ অন্যান্য বিষয়ে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছ গ্রহণ করা ফরয, এমনকি তা যদি খবরে আহাদও হয়।[৩]

৩. কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে এমন নছ্বসমূহ যার মধ্যে রয়েছে আয়াত বা হাদীছের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। এছাড়া আমাদের পূর্বসূরী ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং আমাদের সম্মানিত ইমামগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা। আর আরবদের ভাষায় যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। তবে ভাষাগত দিক থেকে অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা থাকলেও ছাহাবা, তাবেয়ীনদের ব্যাখ্যার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না। সম্ভাব্য কোন অর্থ এর বিপরীত কোন অর্থ বহন করলেও তাদের ব্যাখ্যার উপরেই অটল থাকতে হবে।

৪. রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের মূল বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। এজন্য দীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সংযোজন করার কারও অধিকার নেই।[৪]

---

[২] দেখুন-সূরা আন নিসা ৪:৫৯।

[৩] খবরে আহাদ ঐ হাদীছকে বলে, যে হাদীছ পরস্পরায় অসংখ্য ছাহাবী হতে বর্ণিত হয়নি।

[৪] আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬, ইবনে মাজাহ হা/১৪।

৫. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি আত্মসমর্পন করা ফরয। সুতরাং নিজের মানসিক ঝোঁক বা ধারণার বশঃবর্তী হয়ে, আবেগপ্রবণ হয়ে অথবা বুদ্ধির জোরে বা যুক্তি দিয়ে কিংবা কাশফ অথবা কোন পীর-উস্তাদের কথা, কোন ইমামের উক্তির অজুহাত দিয়ে কুরআন সুন্নাহর বিরোধিতা করা যাবে না।[৫]

৬. কুরআন, সুন্নাহর সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের কোন সংঘাত বা বিরোধ নেই। কিন্তু কোন সময় যদি উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় এমতাবস্থায় কুরআন সুন্নাহর অর্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৬]

৭. আক্বীদাহ সংক্রান্ত বিষয়ে শরীআতসম্মত ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করা এবং বিদ'আতী পরিভাষাসমূহ বর্জন করা ফরয। আর সংক্ষেপে বর্ণিত শব্দসমূহ, যা বুঝতে ভুল-শুদ্ধ উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে, এমতাবস্থায় বক্তা থেকে ঐ সমস্ত বাক্য বা শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া, তারপর তন্মধ্যে থেকে যা হক বা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে তা শরী'আত সমর্থিত শব্দের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হবে, আর যা বাতিল তা বর্জন করতে হবে।

৮. রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ।[৭] আর সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মাহও ভ্রান্তির উপরে একত্রিত হওয়া থেকে মুক্ত। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এ উম্মতের কেউই নিষ্পাপ নন। আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এবং অন্যান্যরা যে সব বিষয়ে মত পার্থক্য করেছেন, সে সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৮] তবে উম্মতের মুজতাহিদগণের যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হবে সেগুলোর জন্য

---

[৫] দেখুন-সূরা আন নিসা ৪:৫৯, ৬৫।

[৬] দেখুন-সূরা আন নিসা ৪:৫৯, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩।

[৭] দেখুন-সূরা আল ফাতহ ৪৮:২

[৮] দেখুন-সূরা আন নিসা ৪:৫৯

সঙ্গত ওযর ছিল বলে ধরে নিতে হবে।[৯] [অর্থাৎ ইজতিহাদী ভুলের কারণে তাদের মর্যাদা সমুন্নতই থাকবে এবং তাদের প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ করতে হবে।]

৯. এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ ও ইলহামপ্রাপ্ত অনেক মনীষী রয়েছেন। সুস্বপ্ন সত্য এবং তা নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একাংশ।[১০] সত্য-সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাণী সত্য এবং তা কারামত বা সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো সেটি শরী'আতসম্মত হতে হবে। তবে এটি ইসলামী আক্বীদাহ্ এবং শরী'আত প্রবর্তনের কোন উৎস নয়।

১০. দীনের কোন বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়। তবে উত্তম পন্থায় বিতর্ক বৈধ।[১১] আর যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে শরী'আত নিষেধ করেছে, তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। এমনিভাবে অজানা বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়াও মুসলিমদের জন্য অনুচিৎ, বরং ঐ অজানা বিষয় সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর উপর সোপর্দ করা উচিত।[১২]

১১. কোন বিষয়ে গ্রহণ বর্জনের জন্য ওহীর পথ অবলম্বন করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন বিষয় বিশ্বাস বা সাব্যস্ত করার জন্যও ওহীর পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং বিদ'আতকে প্রতিহত করার জন্য বিদ'আতের আশ্রয় নেয়া যাবে না। আর কোন বিষয়ের অবজ্ঞা ঠেকাতে অতিরঞ্জন করার মাধ্যমে মোকাবেলা করা যাবে না। অনুরূপ কোন বিষয়ের অতিরঞ্জন ঠেকাতে অবজ্ঞাও করা যাবে না। [যতটুকু শরী'আত সমর্থন করে ততটুকুই করা যাবে]

---

[৯] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী ৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৬।

[১০] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী ৬৯৮৩, ৬৯৮৭, মুসলিম ২২৬৩, ইবনে মাজাহ ৩৮৯৪, তিরমিযী ২২৭০।

[১১] দেখুন-সূরা আন নাহল ১৬:১২৫।

[১২] দেখুন-সূরা আল আরাফ ৭:৩৩, সূরা গাফির ৪০:৩৫।

১২. দীনের মধ্যে নব সৃষ্ট সব কিছুই বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আতই হলো পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম।[১৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ক তাওহীদ (التوحيد العلمي الاعتقادي)

১. আল্লাহ তা‘আলার নাম ও ছিফাতের বিষয়ে মূলনীতি হলো- আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তুলনাহীনভাবে, সেগুলোর কোন রকম বা ধরণ নির্ধারণ না করে তার জন্য তা সাব্যস্ত করা। আর যে সমস্ত নাম বা গুণাবলী আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য নিষেধ করেছেন অথবা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ থেকে যে সমস্ত নাম ও গুণাগুণ নিষেধ করেছেন সেগুলোকে নিষেধ করা বা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত না করা। এগুলোর কোন প্রকার বিকৃতি বা এগুলোকে অর্থশূণ্য মনে না করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

কোন কিছুই তার অনুরূপ নয় তিনি সব শুনেন ও দেখেন।[১৪]

তবে কুরআন ও সুন্নাহয় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর যে অর্থ আছে সে অর্থের উপর এবং এগুলোর যে যে বিষয় প্রমাণ করছে সে সব বিষয়ে পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে।

২. আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীকে অন্য কিছুর সাথে সাদৃশ্য করা বা এগুলোকে অর্থশূণ্য মনে করা কুফরী। আর এটাকে বিকৃত করা, যাকে

---

[১৩] দেখুন-ছ্বহীহঃ নাসাঈ হা/১৫৭৮, নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২/১৫৮১।

[১৪] দেখুন-সূরা আশ শূরা ৪২:১১

বিদ‘আতী সম্প্রদায় ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করে থাকে। এর কিছু পর্যায় রয়েছে তন্মধ্যে কোন কোন বিকৃতি কুফরীর সমতুল্য। যেমনটি করে থাকে বাতেনিয়া সম্প্রদায়,[১৫] আবার কোন কোন বিকৃতি বিদ‘আত ও পথভ্রষ্টতা। যেমনটি আল্লাহর গুণসমূহের অস্বীকারকারীদের ব্যাখ্যা। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা সাধারণ ভুল হিসেবে প্রমাণিত।

৩. ওহদাতুল ওজুদ বা আল্লাহ্ এবং সৃষ্টিকুল এক অভিন্ন সত্তা হিসেবে বিরাজমান মনে করা কুফরী। অথবা আল্লাহ্ তা‘আলা তার কোন সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হন, অথবা কেউ আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে গেছেন বলে বিশ্বাস করাও কুফরী। এ ধরনের যাবতীয় আক্বীদাহ-বিশ্বাস স্বীকারকারী দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

৪. মৌলিকভাবে সকল ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।[১৬] আর তাদের নাম, গুণাবলী, কাজ ইত্যাদি বিষয় ছ্বহীহ্ দলীল প্রমাণ সহকারে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে এবং যতটুকুর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ততটুকু বিশ্বাস করা।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং এর উপরও ঈমান আনয়ন করা যে, ঐ সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআনুল কারীম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তা পূর্বের কিতাবসমূহের বিধি-বিধান রহিতকারী। আরও ঈমান রাখা যে, পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর এজন্যই কেবল অনুসরণ করতে হবে একমাত্র কুরআনের, পূর্বেরগুলোর নয়।[১৭]

---

[১৫] বাতেনিয়া সম্প্রদায় বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা মনে করে থাকে যে, কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের নিকট সেগুলোর গোপন অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, আগাখানী ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, কোন কোন শিয়া সম্প্রদায়, কোন কোন সুফী সম্প্রদায়। এরা সবচেয়ে বেশী ভ্রান্ত আক্বীদাহয় বিশ্বাসী। তাদের অধিকাংশই কাফের।

[১৬] দেখুন-সূরা ফাত্বির ৩৫:১, সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬।

[১৭] দেখুন-সূরা আলে ইমরান ৩:৭৮, আন আন নিসা ৪:৪৬, ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৬১-৭৩৬৩।

৬. সকল নাবী ও রসূলগণের উপর ঈমান রাখা এবং মানুষের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। কেউ যদি নাবীদের সম্পর্কে এর বিপরীত মত পোষণ করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যে সকল নাবীর ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআন বা ছুহীহ্ হাদীছে আলোচনা রয়েছে তাদের উপর নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে। বাকীদের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে।[১৮] আরো ইমান আনতে হবে যে, মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল মানুষের জন্যে রসূল করে পাঠিয়েছেন।

৭. ঈমান আনতে হবে যে, মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়েছে। আর তিনি সর্বশেষ নাবী ও রসূল। যে ব্যক্তি এর বিপরীত আক্বীদাহ্ পোষণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।[১৯]

৮. শেষ দিবসের উপর ঈমান আনতে হবে।[২০] আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সকল ছুহীহ্ সংবাদ ও তার পূর্বে যে সমস্ত আলামত বা নিদর্শনাবলী সংগঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখতে হবে।[২১]

৯. তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান রাখা।[২২] আর তা হলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর অস্তিত্বের পূর্বেই তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তিনি তা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই হয়ে থাকে, আর যা চান না তা হয় না। সুতরাং কেবল আল্লাহ্ তা'আলা যা চাইবেন তা-ই

---

[১৮] দেখুন-সূরা আল বাক্বারা ২:২৮৫, ছুহীহ মুসলিম হা/৮।

[১৯] দেখুন-সূরা আল আহ্যাব ৩৩:২১,৪০, সূরা সাবা ৩৪:২৮, ছুহীহ্ মুসলিম হা/১৫৩।

[২০] দেখুন-সূরা আত-তাওবা ৯:১৮, সূরা আল-আন'আম ৬:৯২, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:৭।

[২১] দেখুন-ছুহীহ মুসলিম হা/২৯০১।

[২২] দেখুন-ছুহীহ মুসলিম হা/৮।

শুধু হবে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। যা ইচ্ছে তিনি তা করেন।[২৩]

১০. দলিল প্রমাণ ভিত্তিক গায়েবের সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে। যেমন, আরশ ও কুরসী,[২৪] জান্নাত ও জাহান্নাম,[২৫] কবরের শাস্তি ও শান্তি,[২৬] পুলছিরাত ও মিযান[২৭] ইত্যাদি। এগুলোতে কোন প্রকার অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

১১. কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ, অন্যান্য নাবীগণ, ফেরেশতা ও নেককার লোকদের সুপারিশ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা যা বলা হয়েছে তাতে ঈমান আনয়ন করা।[২৮]

১২. [আরও ঈমান আনতে হবে যে] কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান ও জান্নাতে সকল মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া হক ও বাস্তব। আর যে তা অস্বীকার করবে অথবা অপব্যাখ্যা করবে সে বক্রপথের অনুসারী এবং পথভ্রষ্ট। তবে দুনিয়াতে কারও পক্ষে দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।[২৯]

১৩. নেক বান্দা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের কারামত সত্য। তবে প্রত্যেক অলৌকিক ঘটনাই কারামত নয়, কখনো হতে পারে এটি

---

[২৩] দেখুন-সূরা আল হাদিদ ৫৭:২২, মুসনাদে আহমাদ হা/২১৬১১, ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৪৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৫৩।

[২৪] দেখুন-সূরা আল বুরুজ ৮৫:১৫, সূরা গফির ৪০:১৫, সূরা আল আরাফ ৭:৫৪, সূরা আত ত্বহা ২০:৫, সূরা আল মু'মিনুন ২৩:১১৬, সূরা আন নামল ২৭:২৬, সূরা আল বাকারা ২:২৫৫।

[২৫] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৪৯, ৬৫৪৬-৬৫৭৪।

[২৬] দেখুন-সূরা আল-মু'মিন ৪০:৪৬, সূরা আল্ আন্আম ৬:৯৩, সূরা হামীম আস্ সাজ্দাহ্ ৪১:৩০, ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৫৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭।

[২৭] দেখুন-সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:৪৭।

[২৮] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৬৬,

[২৯] দেখুন-সূরা আল কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩, ছ্বহীহ বুখারী ৭৪৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮০, ১৮১।

প্ররোচনা মাত্র। কখনো বা এটি শয়তানের প্রভাবে বা মানুষদের যাদুর প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে। বিশেষ করে এসব বিষয় ও কারামতের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক না হলে সেটাকে কারামত বলা যাবে না।

১৪. প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু। আর প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে এই বেলায়েত বা বন্ধুত্বের পরিমাণ নির্ণিত হবে তার ঈমান অনুযায়ী।[৩০]

তৃতীয় অধ্যায়

التوحيد الإرادي، الطلبي (توحيد الألوهية)

ইচ্ছা বা চাওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়্যা)

১. আল্লাহ তা‘আলা এক, একক। তার রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, নামসমূহ এবং গুণসমূহে কোন শরীক নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের রব এবং যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার তিনিই একমাত্র অধিকারী।

২. দু‘আ, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, ত্রাণ চাওয়া, মান্নত, যবেহ, ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা, ভালোবাসা এবং এমনি ধরনের সকল ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা শির্ক। যে উদ্দেশ্যেই তা করে থাকুক না কেন, চাই তা কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার জন্য করুক বা কোন নাবী-রসূলের জন্য করুক, অথবা কোন সৎ বান্দার জন্যই হোক বা অন্য কারও জন্য হোক।[৩১]

---

[৩০] দেখুন-সূরা ইউনুছ ১০:৬২-৬৩, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১১, সূরা আল মায়িদা ৫:৫৫-৫৬, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫০২

[৩১] এ সবই বড় শির্ক।

৩. ইবাদতের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, ভালোবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।[৩২] এর কোন অংশ বাদ দিয়ে অপর অংশ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা পথভ্রষ্টতা। কোন আলিম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় না করে বা তার রহমতের আশা না করে শুধুমাত্র তার ভালোবাসায় ইবাদত করে, সে ব্যক্তি যিন্দীক[৩৩] এবং যে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় কিন্তু তাকে ভালোবাসে না বা তার রহমতের আশা করে না, সে ব্যক্তি হারুরী[৩৪]। আর যে ভয়-ভীতি ও ভালোবাসা শূণ্য হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের আশায় তার ইবাদত করে। সে মুরজিয়া[৩৫] সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪. সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা,[৩৬] পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তার রসূলের প্রাপ্য। আর আইন-বিধান প্রদানকারী হিসেবে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা, আল্লাহ্‌কে রব ও ইলাহ হিসেবে ঈমান আনয়ন করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান ও নির্দেশ প্রদানে আল্লাহর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আর যে বিষয়ে আল্লাহর অনুমোদন নেই, এমন বিধান প্রবর্তন করা বা তাগুত তথা আল্লাহ্‌বিরোধী শক্তির নিকট ফায়ছালা

---

[৩২] তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সাজদা ৩২:১৬)

[৩৩] যিন্দীক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করে বটে কিন্তু ভেতরগতভাবে কাফের।

[৩৪] হারুরী বলতে খারেজী সাম্প্রদায়কে বুঝায়। যারা কবীরা গুণাহকারীকে কাফের বলে বিশ্বাস করে।

[৩৫] মুরজিয়া হচ্ছে, ঐ সমস্ত লোক, যারা মনে করে যে, ঈমানের পরে আমলের কোন প্রয়োজন নেই, গোনাহ করলে ঈমানের কোন সমস্যা হয় না, তারা অপরাধ করতে থাকে আর আশা করতে থাকে যে, সব মাফ হয়ে যাবে। গোনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন ভয় কাজ করে না।

[৩৬] হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। সূরা সূরা আল বাক্বারা ২:২০৮

চাওয়া, অথবা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী‘আত ব্যতীত অন্য কোন শরী‘আতের অনুসরণ করা এবং ইসলামী শরী‘আতের কোন প্রকার পরিবর্তন করা কুফুরী। আর কেউ যদি মনে করে যে ইসলামী শরী‘আতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার কারো রয়েছে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহর অবতীর্ণ আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন করা বড় কুফুরী।[৩৭] কিন্তু অবস্থার আলোকে কখনো কখনো এটি ছোট কুফুরীর পর্যায়ে পড়বে। বড় কুফুরী হবে তখন, যখন আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন অবশ্যম্ভাবী করে নিবে, অথবা অন্য আইন দিয়ে শাসন করাকে বৈধ করে নিবে। আর ছোট কুফুরী হবে তখন, যখন আল্লাহর আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনায় প্রবৃত্তির টানে আল্লাহর শরী‘আত থেকে সরে এসে অন্য কোন আইন দিয়ে ফায়ছালা করে।

৬. দীনকে হাকীকত ও শরী‘আত ভাগ করা এবং মনে করা যে, হাকীকাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ওলী বুজুর্গগণ। আর শরী‘আত শুধু সাধারণ মানুষকেই মানতে হবে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তা মানার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অনুরূপভাবে, রাজনীতি ও এরূপ অন্যান্য বিষয়কে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করা, এসবই বাতিল-অসার কথা। বরং ইসলামী শরী‘আত বিরোধী যাবতীয় হাকীকত অথবা রাজনীতি অথবা অন্য সকল কিছুই অবস্থা ও পর্যায় ভেদে হয় কুফরী, না হয় পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য হবে।

৭. গায়েবের বিষয়াদি শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে এমন ধারণা পোষণ করা কুফরী। তবে

---

[৩৭] আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির। সূরা আল মায়িদা ৫:৪৪

এও ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় গায়েব সংক্রান্ত অনেক বিষয় তার রসূলগণকে পরিজ্ঞাত করেছেন।[৩৮]

৮. জ্যোতিষ ও গণকদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফুরী। আর কোন কিছু গণনা বা পরীক্ষার জন্য তাদের নিকট যাওয়া কবীরা গুনাহ।[৩৯]

৯. কুরআনুল কারীমে যে অসীলা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ঐ সমস্ত বৈধ ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। **অসীলা তিন প্রকার:**

এক- শরীয়াতসম্মত বা বৈধ (مشروع): আর তাহলো আল্লাহ তাআলার নাম ও তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে বা ব্যক্তির নিজের নেক আমলের মাধ্যমে অথবা কোন নেককার ও জীবিত লোক দ্বারা দু'আ করার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা।[৪০]

দুই- বিদ'আতী (بدعي): আর তাহলো শরীআত পরিপন্থি কোন পদ্ধতিতে অসীলা তালাশ করা, যেমন: নাবী-রসূল বা নেককার লোকদের সত্তার দোহাই দিয়ে, কিংবা তাদের মহিমা বা সাধুতা, তাদের অধিকার ও তাদের সম্মান ও পবিত্রতার দোহাই দিয়ে অসীলা গ্রহণ করা।

তিন- শিরকী (شركي): এর উদাহরণ, যেমন ইবাদতের জন্য মৃতব্যক্তিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা অথবা তাদেরকে আহ্বান করা, ডাকা বা তাদের নিকট প্রয়োজন পূরণ করা চাওয়া এবং সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি।[৪১]

---

[৩৮] দেখুন-সূরা আন-নামল ২৭: ৬৫

[৩৯] দেখুন-হাসান: মুসনাদে আহ্মাদ ৯৫৩৬, আবূ দাউদ হা/৩৯০৪।

[৪০] দেখুন-সূরা আল আ'রাফ ৭: ১৮০, সূরা আল-মায়িদা ৫: ৩৫, মুসনাদে আহ্মাদ

[৪১] দেখুন-সূরা ইউনুস ১০:১০৬

১০. কোন কিছু বরকতময় বা মঙ্গলময় হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহ তা‘আলা যতটুকু ইচ্ছা করেন তাঁর কিছু বান্দাহকে বিশেষভাবে বরকত দান করেন। তবে কোন কিছুর বরকতময় হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে দলিল প্রমাণের উপর। বরকতের অর্থ হলো: কল্যাণ বা মঙ্গলের আধিক্য হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কোন কিছুতে তা অবশিষ্ট থাকা বা কোন কিছুতে তার স্থায়িত্ব লাভ। তন্মধ্যে সময়ে আল্লাহর বরকত। যেমন: কদরের রাত্রি। স্থানের মধ্যে বরকত যেমন। তিনটি মাসজিদ। সেগুলো হলো: মাসজিদুল হারাম, মাসজীদে নাববী এবং মাসজিদে আকসা। বস্তুর মধ্যে বরকত। যেমন: যামযমের পানি। আমল বা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বরকত। যেমন: সকল নেক আমলই বরকতময়। ব্যক্তি সত্তায় বরকত। যেমন: ব্যক্তি হিসাবে সমস্ত নাবীদের সত্তা বরকতময়; কিন্তু কোন ব্যক্তির সত্তা কিংবা স্মৃতির- নামে বরকত চাওয়া জায়েয নয়, শুধুমাত্র রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তা এবং তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বস্তুসমূহ দ্বারা বরকত গ্রহণ করা জায়েয, যখন তা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু রসূলের মৃত্যু ও তার স্মৃতি জড়িত বস্তুসমূহ তিরোহিত হবার পর এ সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

১১. বরকত গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ‘তাওকীফী’ বা কুরআন ও হাদীছ থেকে জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন বস্তু থেকে বরকত নেয়া একমাত্র দলিল প্রমাণের ভিত্তিতেই হতে হবে।

১২. কবর যিয়ারত এবং কবরের নিকট মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তা তিন প্রকার:

প্রথম: শরী‘আত সম্মত: যেমন: আখিরাতকে স্মরণ ও কবরবাসীদের উপর সালাম এবং তাদের জন্য দু‘আ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা।

দ্বিতীয়: বিদ‘আত বা অভিনব পন্থায় যা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থি: যা শির্কের মধ্যে পতিত হওয়ার মাধ্যম। যেমন: আল্লাহর ইবাদত ও তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরের কাছে গমন করা অথবা কবর দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্য নেয়া বা কবরের কাছে সাওয়াব হাদীয়া হিসেবে পেশ করা, অথবা কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবর বাঁধাই করা,

সুসজ্জিত করা ও বাতি দেওয়া অথবা কবরকে মাসজিদ বা ছ্বলাতের স্থান বানানো কিংবা বিশেষ কোন কবরকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ করা ইত্যাদি। কারণ এ ধরনের কাজ থেকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন অথবা শরী‘আতে এর কোন স্থান নেই।

তৃতীয়: শির্কী যা তাওহীদ পরিপন্থি: কবরের নিকট এমন কাজ কর্ম করা যা নির্ভেজাল শির্ক। আর তাওহীদ পরিপন্থি, যেমন কবরস্থ ব্যক্তির কোন ইবাদত করা বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আহ্বান করা, ডাকা এবং কবরস্থ ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বা তার দ্বারা উদ্ধার কামনা করা, অথবা কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা অথবা এর জন্য যবেহ করা, একে উদ্দেশ্য করে মানত করা, ইত্যাদি।

১৩. "কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত মাধ্যম আছে সে সব মাধ্যমের বিধি-বিধান সে উদ্দিষ্ট বস্তুর বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।" সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক হয় বা আল্লাহ্‌র দীনের মধ্যে বিদ‘আতের প্রসার ঘটবে এমন যাবতীয় মাধ্যম বন্ধ করা ফরয। আর দীনের মধ্যে সৃষ্ট অভিনব সকল কাজই বিদ‘আত । আর প্রতিটি বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।[৪২]

চতুর্থ অধ্যায়

আল ঈমান (الإيمان)

১. ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম, যা বাড়ে এবং কমে।[৪৩] অতএব ঈমান হচ্ছে: অন্তর ও মুখের কথা এবং অন্তর, মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের নাম। অন্তরের কথা হলো বিশ্বাস ও সত্যায়ণ করা।

---

[৪২] আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। ঐরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আত ভ্রান্তি ও সুপথ থেকে বিচ্যুতি। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই হবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থিতি। নাসাঈ হা/১৫৭৮, ছহীহ।

[৪৩] দেখুন-সূরা আত তাওবা ৯:১২৪, সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩, সূরা আল আহযাব ৩৩:২২।

মুখের কথা হলো স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরের কাজ হলো তা মেনে নেয়া, একনিষ্ঠতা সহকারে করা, এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, ভালোবাসা ও সৎ কাজের ইচ্ছা করা। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ হলো আদেশকৃত সকল কাজকে বাস্তবায়িত করা এবং নিষেধকৃত সমস্ত কাজ বর্জন করা।[৪৪]

২. আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের কাজ। আর যে ব্যক্তি ঈমানের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করে নেবে যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয় সে অবশ্যই বিদ‘আতকারী।

৩. যে ব্যক্তি " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ) এ দুই সাক্ষ্যের মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করবে না, তাকে দুনিয়া বা আখিরাত কোন অবস্থাতেই ঈমানদার বলা যাবে না।

৪. ইসলাম ও ঈমান দু’টি শারঈ পরিভাষা। কখনো কখনো পরিভাষা দু’টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো বা একটি অপরটির সম্পূরক। প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন নয়। আর কেবলার অনুসারী সকল ব্যক্তিই মুসলিম।[৪৫]

৫. কবীরা গুণাহকারী ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে না। দুনিয়ায় তাকে দুর্বল ঈমানদার বলা হবে এবং তার আখিরাতের বিষয় আল্লাহর ফায়ছালার উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন বা শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী একজন মুমিন

---

[৪৪] দেখুন-সূরা আল আসর ১০৩:৩, সূরা আত তীন ৯৫:৬, সূরা আল আরাফ ৭:৪২, সূরা আল ইনশিকাক ৮৪:২৫।

[৪৫] দেখুন-ছহীহ বুখারী হা/৩৯১.৩৯২, ৩৯৩; সুনানে আবূ দাউদ হা/২৮০০, নাসাঈ হা/১৫৮১

গুনাহের কারণে শাস্তি ভোগ করলেও শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের কেউই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না।[৪৬]

৬. নির্দিষ্টভাবে কোন আহলে কিবলা বা মুসলিমকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।[৪৭] তবে হ্যাঁ, শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আখ্যায়িত করা যাবে যাদের বিষয় কুরআন ও সুন্নাতে উল্লেখিত হয়েছে।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরী দুই প্রকার: এক. বড় কুফরী- এ ধরনের কুফরীর কারণে একজন ব্যক্তি দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।

দুই: ছোট কুফরী- এ ধরনের কুফরীর কারণে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে না। কখনো এ কুফরীকে আমলগত বা কর্মগত কুফরী বলা হয়।

৮. কাউকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করা এমন এক ইসলামী বিধান যার একমাত্র ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং শরীআতসম্মত কোন দলিল প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বা কাজের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট করে কোন মুসলিমকে কাফির বলা জায়েয নয়।[৪৮] এমনকি কোন কথা বা কাজ কুফরীর পর্যায় পড়লেও ঐ কারণে যে কাউকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলতেই হবে এমনটি নয়। হ্যাঁ, ঐ পর্যায়ে কাউকে কাফের বলা যেতে পারে যখন তার মধ্যে কুফরীর সমস্ত শর্ত পাওয়া যায় এবং তাকে এ নামে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা আছে তার কোনটি অবশিষ্ট না থাকে। বস্তুত, কারও উপর কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করা খুবই জটিল ও মারাত্মক বিষয়। এজন্য কোন মুসলিমকে কাফের বলার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

---

[৪৬] দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/৯২-৯৪, ৯৭।

[৪৭] দেখুন-ছহীহ বুখারী হা/৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩; সুনানে আবূ দাউদ হা/২৮০০, নাসাঈ হা/১৫৮১

[৪৮] দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/৪৩।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী (القرآن الكريم)

১. বর্ণ ও অর্থ উভয়টি মিলেই কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী। এটি আল্লাহর সৃষ্টি নয়, তার থেকেই এর শুরু এবং তার নিকটেই ফিরে যাবে। এটি এক অকাট্য মুজিযা যার দ্বারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এ কুরআন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।[৪৯]

২. আল্লাহ তা'আলা যার সাথে যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন, তার কথা বাস্তব বর্ণ ও আওয়াজের সমন্বয়ে গঠিত; কিন্তু তার কথা বলার ধরণ আমাদের জানার বাইরে এবং আমরা এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হব না।

৩. কুরআন মাজীদ এক অন্তর্নিহিত ভাবের নাম বা অন্য কিছু থেকে নেয়া এটি একটি বর্ণনা মাত্র অথবা এটি শুধুমাত্র ভাষা ও বুলির অভিব্যক্তি, কিংবা এটি রূপক বা এটি ফায়েয তথা এক অসাধারণভাবে অন্তরে উদিত হওয়া উৎকর্ষের নাম, কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য হচ্ছে পথভ্রষ্টতা ও বক্রতা। আবার কখনো এ ধরণের উক্তি কুফরী। আর 'কুরআন মাখলুক বা সৃষ্টি' এই কথাটি কুফরী।

৪. যে কেউ কুরআনের কোন কিছুকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করবে অথবা মনে করবে যে, এটি ত্রুটিপূর্ণ বা এতে পরিবর্ধন করা হয়েছে অথবা এতে বিকৃতি আছে, সে কাফের।

৫. সালাফে ছুলেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী সঠিক তাবেয়ীগণ যে পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতেই এর ব্যাখ্যা করা ফরয । শুধু নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে কুরআনের ব্যাখ্যা না জায়েয। কেননা; তখন তা হবে, না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা। আর বাতেনীয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত কুরআনের ব্যাখ্যা করা কুফরী।

---

[৪৯] দেখুন-সূরা আল হিজর ১৫:৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত-তাক্বদীর (القدر)

১. ঈমানের স্তম্ভগুলোর অন্যতম একটি স্তম্ভ তাক্বদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ঈমান পোষণ করা। এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হচ্ছে, তাক্বদীর সম্পর্কিত কুরআন সুন্নাহয় যা এসেছে সে সব যাবতীয় কথায় ঈমান আনতে হবে, (সেগুলো হলো: আল্লাহ্‌র জ্ঞান, লিখন, ইচ্ছা, সৃষ্টি) এবং ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার মত কোন শক্তি নেই এবং তার বিধানকে রদ করার কোন অধিকার কারও নেই।[৫০]

২. কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত ইরাদা বা ইচ্ছা ও আদেশ দুই প্রকার:

(ক) পূর্বাহ্নেই স্থিরিকৃত আল্লাহর সৃষ্টিগত ইরাদা বা ইচ্ছা। (মাশীয়াহ বা চরম ইচ্ছা অর্থে) যে নির্দেশ তার স্থিরিকৃত ও সৃষ্টিগত।

(খ) আল্লাহর শরী‘আত সম্মত ইরাদা বা ইচ্ছা। (যে নির্দেশের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অপরিহার্য) যে নির্দেশটি তিনি শরী‘আত হিসেবে প্রদান করেন। আল্লাহর সৃষ্টি জীবদেরও ইচ্ছা এবং চাওয়া রয়েছে, তবে সে সমস্ত ইরাদা বা ইচ্ছা আল্লাহর ইরাদা বা ইচ্ছার অনুগত।

৩. কোন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করা বা পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাদের মধ্যে যাকে তিনি হিদায়াত দান করেছেন, তা তার একান্ত অনুগ্রহেই দান করেছেন। আর যার উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে তাও তার প্রতি আল্লাহর ন্যায় বিচার।[৫১]

---

[৫০] দেখুন-সূরা আদ দাহর ৭৬:৩০, সূরা আত তাকভীর ৮১:২৯

[৫১] দেখুন-সূরা আল আনআম ৬:১২৫, সূরা আল ক্বাসাস ২৮:৫৬, সূরা আল আনআম ৬:৩৯

৪. সৃষ্ট জীব ও তাদের কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, অন্য কেহই এটির স্রষ্টা নন। সুতরাং আল্লাহ্ই বান্দার কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা। আর সৃষ্টিজগত প্রকৃত অর্থেই সেগুলো কার্যে পরিণত করে থাকে।[৫২]

৫. আল্লাহর সকল কাজের পেছনে যে হেকমত নিহিত আছে এটিকে সাব্যস্ত করতে হবে। আরও সাব্যস্ত করতে হবে যে, সমস্ত উপায় উপাদানের প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৬. মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মানুষের হায়াতের সময়[৫৩] নির্ধারণ করেছেন, রিযিক বন্টন করেছেন। আর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এ দু'টিও তিনি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৭. বিপদ ও কষ্টের বিষয়ে তাক্বদীরের যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু পাপ কাজের বিষয়ে তাক্বদীরের যুক্তি দেখানো ঠিক নয়। কেউ এমনটি করলে তাকে তাওবা করতে হবে এবং এজন্য তাকে তিরস্কার করা হবে।

৮. দুনিয়াতে চলার জন্য যে সমস্ত উপায় উপাদানের প্রয়োজন এ সবের উপর নির্ভর করার অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা। অপরদিকে দুনিয়ার আসবাব বা উপায় উপাদান হতে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো, ইসলামী শরীআতকে কলঙ্কিত করা। বস্তু ও উপায় উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা শরীআত ও বুদ্ধি-বিবেক পরিপন্থি। আর আল্লাহর উপর ভরসার অর্থ এই নয় যে, কোন প্রকার উপায় উপাদান অবলম্বন করা যাবে না।

---

[৫২] দেখুন-সূরা আয যুমার ৩৯:৬২, সূরা আল হিজর ১৫:৪২।

[৫৩] দেখুন-সূরা আন নাহল ১৬:৬১, সূরা আলে ইমরান ৩:১৪৫

সপ্তম অধ্যায়

الجماعة والإمامة

আল জামা‘আত ও আল ইমামত (সংঘবদ্ধ জীবন ও নেতৃত্ব)

১. এখানে জামা‘আত বলতে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণকারী তাবেয়ীন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের বুঝান হয়েছে। আর এ জামা‘আতই হলো পরিত্রাণপ্রাপ্ত জামা‘আত। যে ব্যক্তি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তিও ঐ জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও কোন ছোট-খাট বিষয়ে ভুল-ত্রুটি করে।

২. দীনের মধ্যে বিভেদ বা দলাদলি ও মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে কুরআন, সুন্নাহ ও আমাদের সালাফে ছ্বলেহীন তথা সঠিক পথের পূর্বসূরীদের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য।[৫৪]

৩. জামা‘আত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ দেয়া এবং এর প্রতি আহবান করা উচিত। এছাড়া তার সাথে সুন্দর পন্থায় বুঝাপড়া করা এবং কুরআন হাদীছের দলিল প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে তা প্রমাণ/প্রতিষ্ঠিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া কর্তব্য। এরপর তাওবা করে ফিরে আসলে তো ভালোই নচেৎ শরী‘আতের বিধানে যে শাস্তি ভোগ করা দরকার তাই করবে।

৪. কুরআন, হাদীছ ও সুস্পষ্ট ইজমার ভিত্তিতে সাব্যস্ত বিষয়াদিতেই কেবল মানুষদের চলতে বাধ্য করতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষকে তাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করা অবৈধ।

৫. সকল মুসলিমের ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে যে, তারা সঠিক উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসে রয়েছেন। যতক্ষণ না তাদের থেকে এর বিপরীত কোন কাজ পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে সকল সাধারণ মানুষের কথার ব্যাপারে মূল

---

[৫৪] দেখুন-সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩, সূরা আন নিসা ৪:৫৯

কথা হচ্ছে, তাদের কথাকে উত্তম অর্থে গ্রহণ করা। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যার অবাধ্যতা ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যাবে, তা ধামা-চাপা দেয়ার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।

৬. কিবলার অনুসারী, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি সকল ফির্কা বা দলই ধ্বংস ও জাহান্নামের শাস্তির হুমকিপ্রাপ্ত। তাদের ও অন্যান্য শাস্তির সংবাদপ্রাপ্তদের হুকুম একই। তবে কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম কিন্তু ভেতরগতভাবে কুফরী করে তাহলে তার বিধান ভিন্ন। আর ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া সকল ফির্কা সার্বিকভাবে কাফের, তাদের ও ধর্ম-ত্যাগী মুরতাদদের বিধান একই।

৭. জুমু‘আর ছ্বলাত এবং জামা‘আতের সাথে ছ্বলাত আদায় ইসলামের প্রকাশ্য বড় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। কোন মুসলিমের ব্যক্তিগত অবস্থা না জেনে তার পেছনে ছ্বলাত পড়লে তা শুদ্ধ হবে। আর কারো ব্যক্তিগত অবস্থা না জানার দোহাই দিয়ে তার পেছনে ছ্বলাত পড়া থেকে বিরত থাকা বিদ‘আত।

৮. কোন ব্যক্তির বিদ‘আত বা অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়লে, এমতাবস্থায় তারা কারো পেছনে ছ্বলাত আদায় করার সুযোগ থাকলে ঐ ব্যক্তির পেছনে ছ্বলাত আদায় করা অনুচিত, তবে যদি ছ্বলাত আদায় করা হয় তাহলে তাদের (মুক্তাদীদের) ছ্বলাত হয়ে যাবে, কিন্তু মুক্তাদীরা এ কারণে গুণাহগার হবে। তবে যদি বড় ধরনের কোন ফিতনা ঠেকাবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করে, সেটা ভিন্ন কথা। আর যদি অন্য ইমামও এ বিদ‘আতী ইমামের অনুরূপ হয় অথবা তার চাইতে আরো খারাপ হয়, তবে ঐ ইমামের পেছনে ছ্বলাত ছ্বলাত আদায় করা জায়েয হবে। আর এ অজুহাতে জামা‘আত ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর কুফরীর হুকুম দেয়া হলে কোন অবস্থাতেই তার পেছনে ছ্বলাত আদায় করা যাবে না।

৯. রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে উম্মতের ঐক্যের ভিত্তিতে অথবা দেশের ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষমতা রাখেন এমন গ্রহণযোগ্য (প্রধান প্রধান আলিম ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য দায়িত্ববান- ‘আহলুল হাল্লি

ওয়াল আক্বদ’ [أهل الحل والعقد]) ব্যক্তিদের বাই‘আত গ্রহণ করার মাধ্যমে। যদি কেউ জোর করে ক্ষমতা দখল করে, এরপর জনগণ যদি তার শাসন মেনে নেয় তাহলে সৎভাবে তার আনুগত্য করা, তাকে সৎ উপদেশ দেয়া সকলের উপর ফরয এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। একমাত্র তখনই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে যখন তার থেকে সুস্পষ্ট কোন কুফরী পরিলক্ষিত হবে; যে কুফরীর ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে।

১০. মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্যায়মূলক কোন আচরণ করলেও তাদের পেছনে ছলাত আদায় করা বা তাদের সাথে হজ্জ করা এবং তাদের নেতৃত্বে জিহাদ করা কর্তব্য।[৫৫]

১১. পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করা হারাম। মূর্খতামূলক জেদা-জেদি করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৫৬] শুধুমাত্র বিদ‘আতী, সীমালঙ্ঘনকারী এবং এদের মত অন্যান্যদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয। যদি যুদ্ধ ছাড়া এর থেকে স্বল্প কিছু দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়। আবার কখনও কখনও অবস্থা ও স্বার্থ পর্যালোচনা করার পর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্যও হয়ে যাবে।

১২. ছাহাবায়ে কেরামগণ প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ এবং মুসলিম উম্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। ছাহাবায়ে কেরামদের ঈমান ও ফযীলতের স্বাক্ষ্য দেয়া একটি অকাট্য মূলনীতি ও দীনের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। আর তাদেরকে মহব্বত করা দীন ও ঈমানের দাবী। তাদের সাথে দুশমনি করা কুফরী ও মুনাফেকী। তাদের মাঝে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মতবিরোধ বা বিবাদ হয়েছে তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্মানের ক্ষতিকর বিষয় আলোচনা পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

---

[৫৫] দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩৫, ১৯৩৬, ১৮৫৪, ১৮৫৫।

[৫৬] দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/৬৪।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যথাক্রমে[৫৭] আবু বকর তারপর ওমর তারপর ওসমান তারপর আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এবং এ চার জনকেই বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদা। ক্রমানুসারে তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩. প্রত্যেক মুসলিমের নিকট দীনের অন্যতম আরো একটি দাবী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজনকে ভালোবাসা। তাদেরকে আপন মনে করা এবং তাদের স্ত্রীদের সম্মান ও তাদের মর্যাদা অনুধাবন করা। দীনের আরো দাবী সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ীন ও রসূলের সুন্নাতের অনুসারী সকল আলিমদের ভালোবাসা[৫৮] এবং বিদ‘আতী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

১৪. আল্লাহর পথে জিহাদ করা ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ চলতেই থাকবে।[৫৯]

১৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ[৬০] ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন এবং ইসলামী জামা‘আতকে টিকিয়ে রাখার এটি একটি উত্তম হাতিয়ার। সমর্থ অনুযায়ী এ কাজ করা সকল মুসলিমের উপর কর্তব্য এবং স্বার্থ ও অবস্থার আলোকে এ দায়িত্বকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলও বলা হয়। এ জামা‘আতের লোকদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা

---

[৫৭] দেখুন-ছহীহ বুখারী হা/৩৬৫৫।

[৫৮] ছহীহ বুখারী হা/৩৬৫০-৩৬৫১, ৩৭১৩, ৩৭৫১; মুসলিম হা/২৫৪০-২৫৪১।

[৬০] আমার উম্মতের একদল লোক ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্য দীনের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে। ছহীহ মুসলিম ১৯২৩।

[৬০] আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪)

পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাদের কিছু নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে তা বর্ণিত হলো:

১. আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান:[৬১] তারা কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ ও গবেষণার মধ্যদিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছকে জেনে-বুঝে এবং ছ্বহীহ হাদীছকে দুর্বল হাদীছ হতে চিহ্নিত করে হাদীছের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। (এর কারণ হলো, কুরআন ও সুন্নাহই তাদের জ্ঞানের মূল উৎস) এছাড়া তারা জ্ঞান অর্জন করে তা আমলে পরিণত করেন।

২. পরিপূর্ণভাবে দীনের মধ্যে প্রবেশ করা:[৬২] পুরো কুরআনের উপর বিশ্বাস করা। সুতরাং তারা কুরআনে আলোচিত ভালো ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এবং শাস্তির হুমকি সংক্রান্ত আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনেন। যেমনিভাবে তারা আল্লাহর গুণাগুণ সাব্যস্ত আয়াতসমূহে ঈমান ও যে সমস্ত গুণাগুণ থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র সেগুলো যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাতেও ঈমান রাখেন। আর তারা সমন্বয় সাধন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীরে ঈমান আনয়নের পাশাপাশি বান্দার জন্য ইচ্ছা, চাওয়া ও কার্যক্ষমতা সাব্যস্ত করেন। অনুরূপভাবে তারা সমন্বয় বজায় রাখেন ইলম ও ইবাদতের মধ্যে, শক্তি ও রহমতের মধ্যে, উপায় অবলম্বন করে কাজ করা ও পরহেযগারী করে দুনিয়াবিমুখতার মধ্যে।

৩. অনুসরণ করা ও বিদ‘আত পরিত্যাগ করা:[৬৩] তারা কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করেন, বিদ‘আতকে পরিহার করেন, সংঘবদ্ধ জীবন

---

[৬১] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৭৭; ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২১১, ২২৬, ২২৭, ২৩০।

[৬২] দেখুন-সূরা আল বাকারা ২:২০৮।

[৬৩] দেখুন-ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৭৭।

যাপন করেন এবং দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল পথ বর্জন করেন।

৪. হিদায়াতের ন্যায়পরায়ণ ইমামদের অনুকরণ, অনুসরণ: তারা হিদায়াত পাওয়ার জন্য ছাহাবা এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যারা ছিলেন ইলম, আমল ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব এমন হিদায়াতের ধারক ও বাহক ইমামদের পথ অনুসরণ করেন এবং যারা উক্ত ইমামদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পরিহার করেন।

৫. তারা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী:[৬৪] আক্বীদাহ সংক্রান্ত বিষয়ে না তারা অতিরঞ্জিতকারীদের মত, না এ বিষয়কে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা পোষণকারীদের মত। এভাবে সমস্ত কাজকর্ম এবং আচার ব্যবহারে তারা বাড়াবাড়ি ও কমতি এ দু’য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী।

৬. সব সময় তারা মুসলিমদের সত্য পথে একত্রিত করতে সচেষ্ট থাকেন:[৬৫] আর তারা [আল্লাহ্‌র] তাওহীদ ও [রসূলের] অনুসরণের উপর মুসলিমদের সকল কাতার একত্রিত করার জন্য এবং তাদের মাঝে অনৈক্যসৃষ্টিকারী সকল কিছুকে দূরীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কাজেই দীনের মৌলিক বিষয়গুলিতে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু সুন্নাত ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম ও সুন্নাতের ভিত্তিতেই শত্রুতা বা বন্ধুত্ব করেন।

৭. তারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন। সৎ কাজের আদেশ দেন ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রসূলের সুন্নাতকে জীবিত

---

[৬৪] দেখুন-সূরা আল বাকারা ২:১৪৩, সূরা আল মায়িদা ৫: ৭৭, ৮৭। ছহীহ মুসলিম হা/১৪০১।

[৬৫] দেখুন-সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩

করেন, বিদ‘আতকে দূর করেন। আর তারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮. ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা: তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠিস্বার্থের চাইতে আল্লাহর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা না কারো ভালোবাসায় অতিরঞ্জিত করেন, তারা না কারো দুশমনিতে সীমালঙ্ঘন করেন, আর না কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে অস্বীকার করেন।

৯. জ্ঞান আহরণের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ্[৬৬] হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে, যদিও তাদের যুগ বা ভূখণ্ড ভিন্ন হউক।

১০. সকল মানুষের সাথে অনুগ্রহ, দয়া এবং উত্তম আচরণ করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৬৭]

১১. আল্লাহ তা‘আলা, তার কিতাব-আল কুরআন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিমদের নেতাগণ এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য নছীহত[৬৮] করাও তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. মুসলিমদের সমস্যাদির গুরুত্ব দেয়া, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৬৯]

---

[৬৬] দেখুন-ছহীহ বুখারী হা/৭২৭৭, ৩৪৬১; ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২১১, ২২৬, ২২৭।

[৬৭] দেখুন-সূরা আন নাহল ১৬:৯০, ছহীহ: তিরমিযী হা/১৯২০, ১৯২২, ২০০২।

[৬৮] আল্লাহর জন্য নছীহতের অর্থ হলো-তার জন্য শির্কমুক্ত ইবাদত করা, তার নাম ও গুণবাচক নাম সমূহের উপর বিশ্বাস রাখা। কুরআনের জন্য নছীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা। রসূলের জন্য নছীহতের অর্থ-তার রিসালাতকে স্বীকার করে নিয়ে তার দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা। দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/৫৫।

[৬৯] দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯, ২৫৫৯, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৮০।